বিজ্ঞান অন্বেষক -এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো: ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৫ | সংখ্যা ৬ | নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০০৮ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

ভারতে শক্তির চিত্র

আরো ব্যবহার, আরো শক্তি, কিন্তু কার স্বার্থে?

আমাদের দেশে, ব্যবহার্য শক্তির ৪০ শতাংশেরও বেশি আসে চিরাচরিত জ্বালানি অর্থাৎ কাঠ, ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং প্রাণীজ বর্জ্য থেকে, চিত্রটি উন্নততর দেশগুলির থেকে একেবারেই আলাদা। জীবাশ্ম জ্বালানি যথা কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির নিষ্কাষণ ও ব্যবহার এবং শক্তির খরচ বছর-বছর উর্ধ্বমুখী। এদের মধ্যে শক্তির উৎস হিসেবে কয়লার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, দেশের মোট প্রয়োজনীয় শক্তির ৬৩ শতাংশ আসে এই কয়লা থেকেই, যেখানে পেট্রোলিয়াম থেকে আসে ৩০ শতাংশের মতো। জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়াও ভারতে মজুত আছে জলবিদ্যুতের সম্ভাব্য ভাণ্ডার (প্রায় ৮৪ হাজার মেগাওয়াট) যার মধ্যে ২৪ শতাংশ খরচ করা হয়ে গেছে। গত কয়েক দশকে ভারতে ব্যবহৃত মোট শক্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর শক্তির অ-বাণিজ্যিক উৎসের তুলনায় বাণিজ্যিক উৎসের দিকে পাল্লা ভারী হয়েছে।

বাণিজ্যিক শক্তির শতকরা ৫২ শতাংশ ব্যবহার করে ভারতের শিল্পক্ষেত্র। সারা বিশ্বে মাথা-পিছু

এর পর ৪ পাতায়

সাপের টুকিটাকি

গত সংখ্যার পর

সাপের বিষ থেকে ওষুধ তৈরি

সাপের বিষ থেকে জীবনদায়ী 'অ্যান্টিভেনিন' নামক ওষুধ তৈরি হয়। এর সাহায্য ছাড়া সাপে কাটা (বিষধর) রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। সাপে কাটা রোগীর একমাত্র ওষুধ এই 'অ্যান্টিভেনিন' ভারতে হফ্‌কিন্স্ ইন্সটিটিউট, মুম্বাই এবং কাসুলি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থায় বর্তমানে তৈরি হয়। বেঙ্গল কেমিক্যালস্, কলকাতা সহ আরও তিনটি ইউনিট এখন বন্ধ আছে; তার কারণ, যে নিয়ম মেনে এই ওষুধ তৈরির কথা সেই নিয়ম মানা হচ্ছিল না দেখে ভারতের 'ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা' (Drug control of India) এটিকে আপাতত বন্ধ রেখেছে। উল্লেখ্য, যে সহনমাত্রার বিষ ঘোড়ার দেহে ঢুকিয়ে, ঘোড়ার দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে ঘোড়ার রক্তের 'সিরাম' সংগ্রহ করে লায়োফিলাইজড্ পদ্ধতিতে শুকিয়ে পাউডার আকারে এই অ্যান্টিভেনিন তৈরি হচ্ছে এখন। এই পাউডারকে ৫ বছর পর্যন্ত 'হিম তাপমাত্রায়' সংরক্ষণ করা যায়। তবে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিস্তর ফারাক দূর করতে এখনই সুনির্দিষ্ট নির্ধারিত নিয়ম মেনে বন্ধ ইউনিটগুলো চালু করা দরকার।

এছাড়া সাপের বিষ থেকে পেশি- সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের ওষুধ, বেদনানাশক বিভিন্ন ওষুধ, স্নায়বিক কুষ্ঠরোগের বিশেষ ওষুধ তৈরি হয়। হিমোফিলিয়া রোগীর ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, রেটিনা, জরায়ুর রক্তক্ষরণ, দাঁতের গোড়া থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধেও সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। কলেরা, টিউমার নিরাময়েও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ইঁদুর পেস্ট দমনে : কৃষিক্ষেত্রে ইঁদুর একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক 'জীব' যাকে পেস্ট হিসেবে ধরা হয়। এর নিয়ন্ত্রণ করার বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও, এর বাড়বাড়ন্ত কমছে না। ফলস্বরূপ, পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ফসলের ক্ষতি করে চাষীভাইদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। গুদামজাত শস্যও এরা ব্যাপক পরিমাণে ধ্বংস করছে। এছাড়া অন্যান্য ভয়ানক রোগ (যেমন- প্লেগ) তো ছড়াচ্ছেই এই ইঁদুর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে ১৮৯৮ সালে থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশে 'প্লেগে' আক্রান্ত হয়ে আনুমানিক ২,৪৭,০১৫ জন মানুষ মারা গেছেন। ভারতে গড়ে প্রতিবছর ৭৫০-৮০০ কোটি টাকার বেশি খাদ্যশস্য নষ্ট করে এই ইঁদুর। সমীক্ষা

এর পর ২ পাতায়

কার্বন বাণিজ্য এবং জলবায়ুর পরিবর্তন

আজ সম্ভবত এরকম একটা সময়ে আমরা পৌঁছে গেছি যখন দেশের সমস্ত নাগরিক ও সামাজিক উদ্যোগের বিভিন্ন কর্মসূচির একদম প্রথম সারিতে রাখা দরকার হয়ে পড়েছে পৃথিবীর উষ্ণতা, জলবায়ু জনিত সংকট, কার্বন-বাণিজ্য— এই জাতীয় পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে। এতদিন এইসব বিষয়কে 'সবুজ' বা 'পরিবেশমূলক' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছিল। ধরে নেওয়া হত সামাজিক অন্যান্য 'গণ-প্রতিরোধ'-মূলক বিষয়ের কাছে এটি নেহাৎই তুচ্ছ একটি বিষয়। আজ বোধ হয় একটু অন্যরকমভাবে ভাবার দরকার হয়ে পড়েছে।

জলবায়ু জনিত সংকট

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় একথা আমরা ছোটবেলাতেই বইতে পড়েছি। কিন্তু এখন জানতে পারছি আজকের দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের আসল কারণ পৃথিবীব্যাপী 'শিল্পায়ন' ও তার লেজ ধরে আসা 'উন্নয়নে'র যাবতীয় কার্যকলাপ! সবচেয়ে

এর পর ২ পাতায়

সাপ

১ পাতার পর

বলছে, সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের অন্তত ১০ শতাংশ নষ্ট করে এই ইঁদুর। আর এই ইঁদুরকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের খাদ্যের নিশ্চিত যোগান দিতে নীরবে সাহায্য করে যাচ্ছে এই সাপ। সেই হিসেব ধরলে, ইঁদুর থেকে মানব সমাজের যা ক্ষয়ক্ষতি হয় (ফসল ধ্বংস ও মৃত্যু - বিভিন্ন মহামারী রোগের বাহক হিসেবে) তার চাইতে প্রতিবছর অনেক কম ক্ষতি করে সাপে (সাপের কামড়ে মৃত্যুজনিত কারণে)।

অন্যান্য প্রয়োজনে সাপ : প্রতিবছর ভারত থেকে প্রচুর সাপ ও সাপের চামড়া বিদেশে সরকারীভাবে রপ্তানী করা হয় যার বিনিময়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। সাপের চামড়া দিয়ে প্রচুর শৌখিন রকমারি দ্রব্য তৈরি হয়। বেদে এবং সাপুড়িয়া বা সাপের ওপর নির্ভর নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে (যদিও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন আর সেরকমভাবে সাপেদের নিয়ে এরা সম্পূর্ণরূপে জীবিকা অর্জন করতে পারছে না)।

ভারতে বহু প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী (ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের আদিম গোষ্ঠী) সাপকে মাংস হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, তামিলনাড়ুতে 'ইরুলা' জনগোষ্ঠী এদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সাপের চর্বি ব্যবহারের উল্লেখ আছে এবং অনেক অঞ্চলে ব্যথা-বেদনা নাশক হিসেবে এখনও সাপের তেল ব্যবহৃত হয়। ভারতের বাইরে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, যেমন- মায়ানমার, চিন, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড এবং আমেরিকায় সাপের মাংস খুবই জনপ্রিয়। আমেরিকা সহ ইউরোপের আরও অন্যান্য দেশে ক্ষুধা উদ্রেককারী হিসেবে সাপের মাংস ব্যবহৃত হয়।

সর্বোপরি, সাপ বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম সদস্য, খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য' বজায় রাখতে সাহায্য করে। বহু প্রাণী যেমন- ময়ূর, চিল, ঈগল, পেঁচা খাদ্যের ব্যাপারে এদের উপর নির্ভরশীল। আবার, অনেক সাপের খাদ্যই হল সাপ।

অতিরিক্ত সংযোজন

সাপ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য : ভারতে প্রথম গোক্ষুর/গোমা (Cobra) জাতীয় সাপের অ্যান্টিভেনিন তৈরি করা সম্ভব হয় ১৯০৪ সালে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র গোক্ষুর/ গোমা এবং চন্দ্রবোড়ারই অ্যান্টিভেনিন তৈরি হতো আমাদের দেশে। বর্তমানে 'Poly valent Antivenin' তৈরি করা হয় যাতে 'Big Four' অর্থাৎ প্রধান চারটে সাপের বিষ ব্যবহৃত হয় (গোঙুরের সবকটি প্রজাতি, কালাচ, চন্দ্রবোড়া এবং করাতের মত আঁশযুক্ত বোড়া সাপ) কারণ, ভারতে শতকরা ৯০ ভাগ সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটে এই সাপগুলো থেকেই। তবে এটাও ঠিক যে, ভারতে এখনও পর্যন্ত শঙ্খিনি, অন্যান্য করেত সাপ, শঙ্খচূড়, সামুদ্রিক সাপ, প্রবাল সাপ প্রভৃতির কোন অ্যান্টিভেনিন তৈরি হয় না।

— রাজা রাউত,
০৩৫৬১-২৭৭১৯৯,
৯৪৭৪৪-১৭১৭৮

কার্বন-বাণিজ্য

১ পাতার পর

দুঃখের বিষয় হল, খরা-বন্যা তাপপ্রবাহ শৈত্যপ্রবাহ জলসংকট বা হারিকেন টাইফুন-সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোপে পড়ছে যে মানুষরা তারা বেশিরভাগই জানে না যে তাদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী আসলে 'প্রকৃতি' নয় — 'মানুষই'। প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে যে উন্নয়ন ও বিলাসী জীবনযাপন ক্রমশ পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশের তথা বিশ্বের সমস্ত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

খনিজ জ্বালানি অর্থাৎ তেল বা কয়লা পুড়ে 'গ্রিনহাউস গ্যাস' তৈরি হয় যার মধ্যে মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধান। বায়ুমণ্ডলে সাধারণভাবে যতটা থাকার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এই গ্যাস তৈরি হচ্ছে অপরিমিত খনিজ জ্বালানি ব্যবহারের ফলে। এতে পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। প্রাক্ শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ইতিমধ্যেই বেড়ে গেছে ২৮০ পিপিএম (parts per million) থেকে ৩৯৭ পিপিএম। মিথেন বেড়েছে ৭১৫ পিপিবি (pars per billion)। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ার ফলস্বরূপ —

- ১৯০৫ সালের তুলনায় ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়েছে ০.৭৪° সেন্টিগ্রেড।
- ভূপৃষ্ঠের বরফ গলে যাবার ফলে সমুদ্রের জলতল বেড়েছে।
- সুমেরুর বরফ ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতি দশ বছরে কমেছে ২.৭ শতাংশ।
- ১৯৫০ সাল থেকে উত্তর গোলার্ধের বসন্তকালীন বরফ জমার হার কমেছে ৭ শতাংশ।
- গত ১৫০ বছরে উত্তরের নদী ও হ্রদের ওপর বরফ জমার তারিখ পিছিয়েছে প্রতি শতাব্দীতে ৫.৮ দিন করে ও বরফ গলার তারিখ এগিয়েছে ৬.৫ দিন করে।
- বিংশ শতাব্দীতে যা দেখা গেছে তাতে মনে করা হচ্ছে যে উত্তর গোলার্ধে বৃষ্টিপাত ক্রমশ বাড়তে থাকবে এবং উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কমতে থাকবে। উত্তপ্ত আবহাওয়া ও তাপপ্রবাহ বাড়তে থাকবে।
- ১৯৭০ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ আধানাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে খরার মরশুম দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র হয়েছে।

কার্বন বাণিজ্য (Carbon trading)

১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বের জলবায়ু-জনিত সংকটের প্রধান কারণ গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন কমাবার লক্ষ্যে একটা বাজারমুখী 'মুক্ত' কর্মসূচি নেওয়া হল আন্তর্জাতিক স্তরে। অনেকেই বললেন, কিয়োটো চুক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্তরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল আজকের দুনিয়ার প্রথামতো 'বাজার'ই ঠিক করতে লাগল জলবায়ু-জনিত সংকটের সংজ্ঞা কী আর তার সমাধানই বা কী! এভাবেই এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে ধনী রাষ্ট্রগুলো আর তাদের দূষণসৃষ্টিকারী সংস্থাগুলো একটা অতীব লাভজনক ব্যবসা শুরু করল বিশ্ববাতাসে কার্বন কমাবার বাহানায়। তৃতীয় বিশ্বে দূষণসৃষ্টিতে অগ্রগণ্য এমন অনেক সংস্থাই ঝাঁপিয়ে পড়ল এই ব্যবসায়। 'কার্বন-বাণিজ্য' নামক বিমূর্ত এক ব্যবসা বাস্তব রূপ পেল।

এরপর ৩ পাতায়

কার্বন বাণিজ্য

২ পাতার পর

প্রোটোকলে আইনি স্বীকৃতি পাওয়া এই কার্বন বাণিজ্য আজ বিশ্বের দুই গোলার্ধের দূষণ সৃষ্টিকারীদের কাছেই অত্যন্ত লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নতিশীল দেশগুলোর দূষণ ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে যেসব সংস্থা তারাই আবার বিশাল অর্থ আয় করছে বাতাসে কার্বন কমাবার মিথ্যা দাবি করে। তারা কখনও বলছে যন্ত্রপাতির (ডিজাইন) নকশা পালটে কার্বন নির্গমন কমাচ্ছে, কখনও বলছে কিছু গাছ লাগিয়ে কার্বন শোষণ বাড়াচ্ছে। কিন্তু আদতে বাতাসে কার্বন যতটা কমছে বা আদৌ কমছে কিনা সে হিসেব তলিয়ে যাচ্ছে বড় বড় অঙ্ক আর মিথ্যে দাবির আড়ালে। এই কর্মকাণ্ডের কুশীলবরা অর্থাৎ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, উপদেষ্টা, দালাল সবাই বেশ মোটা অর্থ আয় করছে এই মিথ্যে বেসাতির খেলা থেকে যে, খেলার সত্য চেহারা কখনই জনসাধারণের সামনে আনা হয় না।

'বিশ্বায়িত গ্রামে'র দুনিয়ার 'কার্বন বাজারে' এই মিথ্যে দাবিই হু-হু করে বিকোচ্ছে। এমনকী কার্বন বাণিজ্যের সুবিধার্থে স্টক এক্সচেঞ্জও খোলা হয়েছে! উন্নত দেশের 'কার্বন সঞ্চয়ে'র (carbon credit) ক্রেতারা আরো বেশি বেশি কার্বন বাতাসে ছাড়ার ছাড়পত্র পাচ্ছে। ফলে আরো বেশি বেশি ব্যবসা, বেশি বেশি মুনাফা। এভাবেই 'কার্বন বাণিজ্য' আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আইনি প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে যার বিশ্ব বাজার এখন এক বিলিয়ন ডলারের।

আমেরিকা আর চিনের মতো ভারতও গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবার বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতিতে যায়নি কারণ আমাদের দেশ এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনে খনিজ জ্বালানির মুখাপেক্ষী। তথাপি দুনিয়া জোড়া কার্বন বাণিজ্যের লক্ষ্যমুখ ভারত। ৬৫০টিরও বেশি প্রকল্প (Clean Development Mechanism Project) হাতে নিয়ে এ-দেশের তাবড় তাবড় বাণিজ্য সংস্থা — রিলায়েন্স, টাটা, বিড়লা, অম্বুজা, আই টি সি — বিশ্বের 'কার্বন বাজারে' লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে 'কার্বন সঞ্চয়' বিক্রি করতে। পৃথিবীর জঘন্যতম দূষণ সৃষ্টিকারীদের কাছেও লাভের দরজা এভাবেই খুলে দিয়েছে ভারত। বাণিজ্য বন্ধু সরকার আর অজ্ঞ দেশবাসীর সহায়তায় এভাবেই ভারত 'কার্বন বাণিজ্যের' স্বর্গ হয়ে উঠেছে গোটা দুনিয়ার কাছে। আর এভাবেই এ দেশে বিশ্বায়নে তার অবদান রাখছে!

হঠাৎ যদি এমনটা হয় যে 'কার্বন সঞ্চয়' লোভী দূষণ সৃষ্টিকারী ভারতীয় সংস্থাগুলোও রাতারাতি 'নির্মল' হয়ে উঠতে চায়, আর কার্বন শোষক হিসাবে 'বনাঞ্চল' তৈরি করতে শুরু করে অথবা লক্ষ লক্ষ হেক্টার জুড়ে জাট্রোফা জাতীয় (Jatrapha) জৈব জ্বালানি বনাঞ্চল তৈরি করে! অথবা মস্ত মস্ত হাওয়া যন্ত্র (wind mill) বসায়! বা বড়সড় কোনো পারমাণবিক চুল্লি বসাতে মনস্থ করে, তাহলে এই বিপুল পরিমাণ জমি কোথা থেকে আসবে? এর জন্য কত সহস্র পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা হবে? 'উন্নয়ন'-এর চলতি ধারা অনুযায়ী একইভাবে জমি দখল হবে কি? যার শিকার হবে সেই মানুষরাই যারা এতদিন ধরে বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা কৃত্রিম বনাঞ্চল তৈরির কাজে নিজেদের সর্বস্ব হারিয়েছে, তাহলে 'উন্নয়ন' আর চলতি বাজারি বিকল্প আজ এরকমই এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, বরফ চাদর ক্রমশ গলছে, আবহাওয়ার চূড়ান্ত পরিবর্তন মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে আর একই সঙ্গে শিল্পায়িত নগরী শক্তি উৎপাদনে কয়লা আর তেল পুড়িয়ে বাতাসে কার্বন মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে।

বিকল্প শক্তি ব্যবস্থা

মার্কিনী মদতপুষ্ট কিছু ব্যক্তি প্রচার করে থাকেন যে, পারমাণবিক শক্তি খুবই নিরাপদ, পরিবেশ-বান্ধব এবং সুলভ। তাই ভবিষ্যতে এটাই শক্তির প্রধান উৎস হবে। আর তাই ভারত সরকার বর্তমানে চালু এবং নির্মীয়মান ২৩টি পারমাণবিক চুল্লির পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে ২৪টা নতুন চুল্লি বসানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যদিও বেশিরভাগ উন্নত দেশেই গত এক দশকের মধ্যে নতুন কোনো পারমাণবিক চুল্লি তৈরি হয়নি। আমরা কী এমনই একটা ভবিষ্যৎ চাইছি যেখানে 'বিকল্প' শক্তির ছদ্মবেশে দানবীয় পারমাণবিক প্রকল্প, বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বা হাওয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকা বাঁচার পরিবেশ সব কিছু ছিনিয়ে নেবে? সম্প্রতি ভারত মার্কিন পারমাণবিক প্রযুক্তি বিনিময়ের চুক্তি ও মার্কিন প্রশাসনের পারমাণবিক শক্তির সপক্ষে প্রচার আমাদের এরকমটাই ভাবাচ্ছে।

শক্তি উৎপাদনের বিকল্প উৎসগুলি নিয়ে তাই এই মুহূর্তেই আমাদের ভাবনাচিন্তা শুরু করা দরকার। আমাদের দেশে বড় বাঁধ মানেই উচ্ছেদ আর দুর্ঘটনার ইতিহাস। যদিও আমাদের ব্যবহার্য শক্তির যোগান মূলত আসে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকেই। এগুলোকে এখন কিন্তু আর 'নির্মল' বলা যাচ্ছে না। নদীর স্বাভাবিক গতিপথে হস্তক্ষেপের ফলে ধ্বস, বন্যা ইত্যাদি ভয়াবহ দুর্যোগের শিকার হচ্ছে মানুষ। উপকূল জুড়ে বিশাল অঞ্চল নিয়ে স্থাপিত বায়ুচালিত কল স্থানীয় মানুষের দুর্দশা বাড়াচ্ছে যেমনটা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট অঞ্চলে।

আর তাই পারমাণবিক শক্তি, বৃহদাকার বাঁধ আর একরকম 'বাজার সৃষ্ট' বিকল্প শক্তি উৎপাদনের বিরুদ্ধে আমাদের জোরালো প্রতিবাদের সময় এসেছে। ছোটো মাত্রার সম্ভাব্য বিকল্প লোক উদ্যোগ নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা দরকার। কর্পোরেট বড় বড় প্রকল্পের দিক থেকে পেছন ফিরে গণমুখী প্রকল্পের দিকে এগোতে হবে। এটাই হবে ভবিষ্যৎ।

উপসংহার

অতীতের উপনিবেশিক শক্তির মতো আজ বিশ্বের বৃহৎ শক্তি আর 'দেশীয় বাজারি শক্তি' যৌথভাবে হাত বাড়িয়েছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে। বনাঞ্চল ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ অথবা উচ্ছেদ সবকিছুই এদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এ এক ভয়ংকর লড়াই যার কোনো খবর হয় না।

এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষ নেবার সময় এসেছে। ওরা যা করছে আমাদের মঙ্গলের জন্যই করছে' — এই ভাবনাকে মোকাবিলা করার সময় এসেছে।

আজ সময় এসেছে শিল্পোন্নয়নের প্রচলিত ধারণাকে প্রতিহত করার, সময় এসেছে অপচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার, সময় এসেছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে মুনাফাকারী বিশ্বের যাবতীয় দূষণ সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধ করার, সময় এসেছে সঠিক বিকল্প শক্তি বেছে নেবার অধিকার প্রয়োগ করার।

এরপর ৭ পাতায়

ভারতে শক্তির চিত্র

১ পাতার পর

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সবার পেছনে। (Integrated Energy Policy, 2005, PI, GoI).

বিশ্বের গড় যেখানে ব্যক্তি পিছু ১,৬৮৮৮ kgoe (kg of equivalent) ভারতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শক্তির ক্ষেত্রে (২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী) তার পরিমাণ ৫২০ kgoe। ১৯৯১ সালের আগে বাণিজ্যিক, শক্তির ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণভাবে সরকারের অধীনস্থ ছিল। অর্থনৈতিক সংস্কার এবং উদারীকরণের ফলে ৯০-এর দশকের পর এই ক্ষেত্রটার বেসরকারিকরণের দরজা খুলে যায়। তেল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কয়লাই এখনও শক্তির প্রধান উৎস : ভারতে বাণিজ্যিক শক্তির প্রাথমিক উৎস এখনও কয়লাই। চারটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি উৎস — তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ইউরেনিয়াম। এদের মধ্যে কয়লার আভ্যন্তরীণ মজুতের ভান্ডার সবচেয়ে বেশি এবং ভারতে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সবথেকে বড় অংশটি আসে কয়লা থেকে। বর্তমান বাণিজ্যিক শক্তির প্রায় ৫৫ শতাংশ কয়লা থেকে পাওয়া যায়। যা আবার সরাসরি কাজে লাগে রেল পরিবহণের ক্ষেত্রে, তাপবিদ্যুৎ যোগানে, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ঘর-গেরস্থালির কাজে এবং কোনো কোনো শিল্পক্ষেত্রে বিজারক পদার্থ (reducing agent) হিসাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবেও কয়লার ব্যবহার হয়।

১৯৮৪ সালে ১৮০০ লক্ষ টন থেকে ২০০৪ সালে এর ব্যবহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০০ লক্ষ টন। বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। উৎপাদন ক্ষমতার ৬০ শতাংশ তাপবিদ্যুৎ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। (Integrated Energy Polices, 2005 PI GoI)

দশম পরিকল্পনার তথ্য এই ইঙ্গিত করে যে, কয়লার চাহিদা আগামী ২৫-৫০ বছরে জ্বালানি পছন্দের ক্ষেত্রে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাছাই।

ভারতীয় কয়লায় ছাই-এর পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। যার ফলে ভাসমান কণাপদার্থ নির্গত হয় অনেক বেশি আর কয়লার ব্যবহারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বাড়তে থাকে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ।

বাণিজ্যিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং শিল্প বাণিজ্য পরিষেবা মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঃ

ভারতে শক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখ্য, শক্তির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান ফারাক এবং পরিবেশের কাজে ব্যবহৃত শক্তির খরচাপাতি উপভোক্তাদের ঘাড়ে চালিয়ে দেওয়া (environmental extenalities), প্রচুর পরিমাণে শক্তি-নিবিড় ক্ষেত্রগুলির — যথা শক্তি উৎপাদন, ইস্পাত, সিমেন্ট, পরিশোধনাগার, রাসায়নিক সার এবং পরিবহণ ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় শক্তি ব্যবহারের স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ভারতে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ সামগ্রিকভাবে গত পাঁচ দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে আর অ-বাণিজ্যিক উৎসের তুলনায় বাণিজ্যিক উৎসের দিকেই পাল্লা ভারী হয়েছে। স্বভাবতই শক্তির বাণিজ্যিক উৎসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৫৩ থেকে ২০০১-এর মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শক্তির যোগানের মাত্রার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ। এই বৃদ্ধির যোগান বাণিজ্যিক শক্তির ক্ষেত্র থেকেই এসেছে। এই ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩ শতাংশ (অথচ অ-বাণিজ্যিক শক্তি বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক মাত্র ১.৬ শতাংশ)। এই উচ্চ বৃদ্ধির হারের ফলে, বাণিজ্যিক শক্তির অংশ ১৯৫৩-৫৪-য় ২৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০১-০২-তে দাঁড়িয়েছে ৬৮ শতাংশে।

২০০৫-এর মার্চে ভারত উৎপাদনের ক্ষমতাকে প্রায় ১১৫ গিগাওয়াটে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে তাপশক্তির পরিমাণ ৬৯.৪ শতাংশ জল ও পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির (মূলত বায়ু) পরিমাণ ২৮ শতাংশ এবং বাদবাকি আসে আণবিক শক্তি থেকে (GoI এবং MoP, ২০০৫)। যদিও সরকারি নীতি সবসময়ই জল ও পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলিকে উৎসাহ যুগিয়েছে, তবুও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কিন্তু এতটুকুও কমেনি।

সামগ্রিক ক্ষমতার মধ্যে ৮৯ শতাংশ সরকারি ক্ষেত্রে (৫০ শতাংশ রাজ্য সরকারের ও ৩৯ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের) এবং বাদবাকি বেসরকারি ক্ষেত্র (১১ শতাংশ) থেকে আমদানি হয়।

ভারতের শক্তি মন্ত্রকের বক্তব্য অনুসারে, ভারতের প্রাথমিক শক্তির যোগান নিদেনপক্ষে ৩ থেকে ৪ গুণ বাড়ানো দরকার এবং বিদ্যুতের যোগান বর্তমান ও পরিকল্পনা কমিশনের তুলনায় ৫ থেকে ৭ গুণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক যাতে ২০০১ সালের মধ্যে ৮ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে ছোঁয়া যায়। এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য জলজ শক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর জন্য রাজ্য সরকারগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সমূহ দ্রুত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষত NHPC (National Hydroelectric Power Corporation) সব ধরনের সাহায্য পাবে (অজয় শঙ্কর, ২০০৫, দ্য গেজেট অফ্ ইন্ডিয়া; শক্তি মন্ত্রক GoI) ৫০ হাজার মেগাওয়াটের জলবিদ্যুতের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। ৩৩,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পগুলির কাজও জোরকদমে শুরু করেছে ডিপিআর, মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-বৃদ্ধির মান বজায় রেখে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে চায় তারা, যাতে এই জ্বলন্ত প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় যে নতুন প্রকল্পটি স্থানীয় জনসাধারণের উপর কীরকম প্রভাব ফেলবে বা তাদের সামাজিক-বাস্তুতান্ত্রিক (ecological) এবং পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে।

এ দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করার পরও দেখা যাবে ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদার জন্য কয়লাই প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

মানুষ ও পরিবেশের ওপর আণবিক শক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সবকিছু জানার পরও সরকার এর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। বেসরকারি সংস্থাগুলির সহযোগিতাও এর জন্য চাওয়া হবে। সরকার একটি ত্রি-স্তর আণবিক শক্তির কথা ভেবে রেখেছে। প্রথম ধাপে PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) নির্মিত হবে, দ্বিতীয় ধাপে FBRs (Fast Breeder Reactors) এবং ইউরেনিয়াম ২৩৩-থোরিয়াম

এরপর ৫ পাতায়

ভারতে শক্তির চিত্র

৪ পাতার পর

২৩২ ভিত্তিক রিঅ্যাক্টর তৈরি হবে তৃতীয় ধাপে।

আরো শক্তি, আরো জীবাশ্ম জ্বালানি, আরো গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন : বাণিজ্যিক জ্বালানির (কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও শক্তি) বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে, এইসব জ্বালানির দহন বাতাসে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ।

শক্তিক্ষেত্রে, প্রধানত পরিচিত বায়োমাস জ্বালানি, কয়লাখনি এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ছদ্মবেশী ক্ষতিকর ধূলি ও কণা ইত্যাদি fugitive নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি যথা মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড।

নির্গমন, শক্তির সমবণ্টনের জন্য ?

ভারতর সরকার একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে এক দীর্ঘমেয়াদি শক্তি নীতির (এই মুহূর্তে দেশের) প্রয়োজন যা কিনা শুধু ভবিষ্যতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শক্তির চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা পরিবেশের রক্ষায় ও দুষ্প্রাপ্য উৎসভাণ্ডারের সংরক্ষণেও কাজে লাগবে। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছানো কিভাবে সম্ভব ? চলতি নির্গমনের পরিমাণ সুনিশ্চিতভাবে বাড়তে বাধ্য — এই সহস্রাব্দের উন্নয়নের জন্য এবং শক্তির সমবণ্টনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য — এরকম একটা কথা চালু আছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই নির্গমনের পরিমাণ যদি কমে তা মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধির হারকেও, স্বাভাবিকভাবেই কমিয়ে দেবে যা অর্থনীতির উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে বাধ্য। এই দুই মতবাদে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার চালু রাখতেই হবে, এমনকী তা বাড়তেও পারে। শক্তি উৎপাদনের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে তা থেকে তাপ বিদ্যুৎক্ষেত্রের প্রতি একটি নির্দিষ্ট ঝোঁক স্পষ্ট বোঝা যায়, তার অন্তর্নিহিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আরো জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন ও দহনের। আমরা আগেই যেমন বলেছি, ভারত সরকারের দিক থেকে একটা প্রচেষ্টা সর্বদা চালু আছে যে, ভারতের শক্তি নীতি সব সময় উন্নয়নের কর্মসূচির সমবণ্টনের কথাই মাথায় রাখে। আর, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শক্তি ব্যবহারের নানা কর্মসূচিতে যে পরিমাণ নির্গমন হবে তা সর্বতোভাবে শক্তি সাম্যের মূল্যেই হবে। ভারতের পরিবেশ মন্ত্রী এ রাজা ২০০৫-এর ডিসেম্বরে একথা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে ভারতের মতো জনবহুল দেশে যেখানে জনসংখ্যার এক বৃহত্তর অংশ দরিদ্র অসহায় মানুষ সেখানে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন কমবে তা কখনোই জোরগলায় বলা যাবে না, কারণ তা হবে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ধাক্কা। ভারতে উৎপাদিত বাড়তি শক্তি শিল্প পরিষেবা ক্ষেত্রকেই তোষণ করতে লেগে যাবে। কিন্তু সরকারের এই বাগাড়ম্বরের সঙ্গে মেলানো যায় না আমাদের জ্ঞাত অন্য আর একটি তথ্য। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক তুঙ্গদশার মানে হল, আরো শক্তির প্রাপ্যতা যোগান দেওয়া সমাজের উপরতলার উপভোক্তাদের জন্য — এসবের অর্থ তাই কোনোমতেই শক্তির সমবণ্টন নয়।

শক্তিমন্ত্রক ২০১২ সালের মধ্যে সকলের কাছে (বিদ্যুৎ) শক্তি পৌঁছে দেবার এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই চাহিদা পূরণের জন্য বাড়তি ৪৬,৫০০ মেগাওয়াট এক লক্ষ্যমাত্রা মোটামুটিভাবে স্থির করা হয়েছে। তাই শক্তিমন্ত্রকের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলি, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও বেসরকারি ক্ষেত্রগুলি ৪১,৮০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। আর এই সময়সীমার মধ্যেই আণবিক শক্তি উৎপাদিত হবে ৬৪১০ মেগাওয়াট আর এর ফলে এই সব শক্তিক্ষেত্র থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হবে ১৬৪.৪৪ TG কার্বন ডাই-অক্সাইড।

কিয়োটো প্রোটোকলে অংশগ্রহণ করে ভারত ফলাও করে পরিশোধিত পরিচ্ছন্ন উন্নয়নের কথা বলছে। আর ঘরে চলছে সেই এক ব্যবসায়িক মনোভাবে পরিচালিত শক্তি কর্মসূচি। একে তঞ্চকতা ছাড়া আর কী বা বলা যাবে। কারণ ভারত সরকারের সক্রিয় প্ররোচনায় দ্রুত ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে একের পর এক ন্যক্কারজনক সিডিএম প্রকল্পগুলি। এও সরকারি তঞ্চকতার উলটো পিঠ।

ভারতের কৃষ্ণ অরণ্যের গল্প : ভারতীয় বনাঞ্চলের Carbon sequestration Potential সম্পর্কে ভুরি ভুরি আশাবাদের কথা শোনা যায়। নতুন নতুন ব্যবসাযোগ্য কার্বন ভাণ্ডার (Tradable Carbon Reserve) সৃষ্টির এক অসীম সম্ভাবনা — এই দেউলিয়াপনার কাহিনি শুরুর আগে দেখে নেওয়া যাক ভারতের বাদবাকি অরণ্যে কী কাণ্ড ঘটছে।

ভারতের বনাঞ্চল : ভারতীয় বনদপ্তরের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে (State of Forest Report'05) ৬৭০৫ লক্ষ হেক্টার জমি (ভারতীয় ভূখণ্ডের মাত্র ২০.৬৮ শতাংশ) জুড়ে আছে অরণ্য (নীচের তালিকা দ্র.) আর নথিভুক্ত থাকা এই দেশের বনাঞ্চল ৭৬৫২ হেক্টার (মোট ভৌগোলিক ক্ষেত্রের ২৩.২৮ শতাংশ)।

বিভাগ	এলাকা (মিলিয়ন হেক্টার)	ভৌগোলিক ভূখণ্ডের শতাংশ
নিবিড় বনাঞ্চল	৫.১২	১.৫৬
ঘন বনাঞ্চল	৩৩.৯	১০.৩২
উন্মুক্ত অঞ্চল	২৮.৭	৮.৭৬
সামগ্রিক বনাচ্ছাদন	৬৭.৮	২০.৬৪
লতা, গুল্ম আচ্ছাদিত ভূমি	৪.০	১.২৩
বনাঞ্চল ছাড়া বাকি অঞ্চল	২৫৬.৮	৭৮.১৩
সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চল	৩২৮.৭	১০০.০

State of Forest Report 2003 অনুসারে, Forest Survey of India.

কতটা বিশুদ্ধ বনাঞ্চল বিষয়ক তথ্য ?

Forest Survey of India-র (State of Forests Report, 2003) তথ্যের ভিত্তিতে, ভারতের বনাঞ্চল প্রতিমুহূর্তে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৩-এর সমীক্ষা জানাচ্ছে যে, ঘন বনাঞ্চলের প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টার নষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ যেসব স্থানে ৪০ শতাংশ বা তার বেশি অংশ বনের আওতায় সেখানে বননিধনের কাজটি ক্রমাগত হয়েই চলেছে। যেহেতু স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া চিত্রগুলিই এই তথ্যের উৎস, আর হাতেনাতে মিলিয়ে নেওয়ার কাজগুলি আড়ালে আবডালেই চলে ফলে কোথায় কতখানি প্রাকৃতিক বনাঞ্চল চিরতরে হারিয়ে গেল তার হদিশ পাওয়া কঠিন। State of Forests Report আরো জানাচ্ছে যে, এই বননিধন কর্মসূচি কোনো

এরপর ৭ পাতায়

বাদুড়ের ইকোলোকেশন

ইকোলোকেশন (Echolocation) জীবনধারণের সাহায্যে এক অদ্ভুত পদ্ধতি। ইকোলোকেশন কথাটির অর্থ প্রতিধ্বনির সাহায্যে অবস্থান নির্ণয়। বাদুড়ের জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। এছাড়া জলবাসী তিমি এবং ডলফিনের মধ্যেও ইকোলোকেশন দেখা যায়। উপবর্গ Microchiroptera-এর অন্তর্গত বাদুড় (উদা: Rhinolophus sp.) এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

বাদুড় মুখ বা নাক দিয়ে Super sonic sound নিঃসৃত করে যার কম্পাঙ্ক 150 Khz পর্যন্ত হতে পারে এবং যা Radar system-এর মতো কাজ করে। এই শব্দ আমাদের শ্রবণসীমার (20-20000hz) বাইরে। মুখ দিয়ে শব্দ উৎপন্ন হওয়ার সময় এদের মধ্য কর্ণের পেশী সঙ্কুচিত হয়। এই শব্দ তরঙ্গ কোনো বস্তুতে বাধা পাওয়ার পর প্রতিধ্বনিত হয়ে নিজেদের কানেই প্রবেশ করে। এই সময় মধ্য কর্ণের পেশী প্রসারিত হয় অর্থাৎ কানে শব্দ প্রবেশ করার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্তকর্ণতে পাতলা, বড়, শামুখের মতো পেচিয়ে থাকা ব্যাসিলার মেমব্রেন শব্দ তরঙ্গটি গ্রহণ করে এবং কানে উপস্থিত ছোট ছোট রোম কোশগুলিকে উত্তেজিত করে। Spiral ganglion কোশ এবং auditory স্নায়ুতন্তু দ্বারা উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছয়। মস্তিষ্কে বস্তুটির ত্রিমাত্রিক গঠনের প্রতিরূপ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে ইকোলোকেশন বলে।

ইকোলোকেশন-এর মাধ্যমে এই সকল প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখে, শিকার ধরে, চলাফেরা করে ও আত্মরক্ষা করে। শিকার ধরার সময় এরা Patagia (পাতলা চামড়া, যা বাদুড়ের অগ্রপদগুলির আঙুল গুলিকে যুক্ত করে ডানার মতো গঠন সৃষ্টি করেছে) দিয়ে শিকারটিকে ঘিরে ফেলে এবং উদরস্থ করে। লক্ষ্য করার বিষয় বাদুড় নিজের মুখ নিঃসৃত শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে ইকোলোকেট করে, কখনোই শিকারের আওয়াজ শুনে নয়।

বাদুড়ের অবাক করা Radar system device, মানুষের তৈরী Radar system-এর চেয়ে বেশি Radar system 5 মিটারের বেশী দূরত্বে রাখা বস্তুকে শনাক্ত করতে সক্ষম নয়, যেখানে বাদুড়ের মাত্র 1/2 আউন্সের ছোট আকারের Radar system সর্বাধিক ৬ মিটার দূরত্বে রাখা বস্তুকেও শনাক্ত করতে সক্ষম। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এরা 0.5 মিমি ব্যাস বিশিষ্ট তারের অবস্থান ও সহজে টের পায় এবং সূক্ষ্ম তারের বাধাও সহজে অতিক্রম করে।

বায়ো-সোনার পালস্ (Bio-sonar pulse) প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন হয়। এই পালস্ তিন ধরনের যেমন CF (Constant Frequency), FM (Frequency Modulated) এবং CF-FM (Combined).

CF পালস্ দেখা যায় rhinolopid এবং কিছু rhinolophoid বাদুড়ের মধ্যে। এই পালস্ শুদ্ধ পালস্-এর চেয়ে দীর্ঘ (40-100 ms.duration) হয়। CF পালস্ নাসারন্ধ্র থেকে সৃষ্টি হয় এবং এগুলির রিপিটিশন রেট 10/second-এর চেয়ে কম। FM পালস্ দেখা যায় vespertilionid বাদুড়ের ক্ষেত্রে। এই পালস্ বেশী দীর্ঘ নয় vespertiliond বাদুড়ের ক্ষেত্রে। এই পালস্ বেশী দীর্ঘ নয় (1-5 ms. duration) এবং এই পালস্ বাদুড়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, FM পালস্-এর রিপিটিশন রেট সাধারণতঃ 10/second কিন্তু শিকার ধরার সময় 100/second পর্যন্ত হতে পারে। CF-FM পালস্ CF এবং FM উভয়েরই মধ্যবর্তী একপ্রকার পালস্ যার মধ্যে উভয়ের বৈশিষ্ট্যই লক্ষণীয়।

মাছ শিকারি বাদুড়েরা মাছ (50cm গভীরতার মধ্যে) কর্তৃক সৃষ্ট জলের ক্ষুদ্র তরঙ্গ থেকে প্রাপ্ত প্রতিধ্বনি শুনে মাছের অবস্থান নির্ণয় করে। বিভিন্ন রক্তচোষা (Vampire) বাদুড় (যেমন: Desmodus sp.), যারা গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির রক্ত খায় তারা মাটি থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি (5-7´) উপরে নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায়। এই সকল বাদুড় উলম্বভাবে শব্দ নিঃসৃত করে ইকোলোকেট করে। তারপর ধারাল দাঁত দিয়ে চামড়া কেটে রক্ত খায়।

অনেক বছর আগে সম্ভবতঃ ইওসিন (Eocene) যুগে বাদুড়ের আবির্ভাব ঘটে টেথিস সাগরের উত্তর দিকে। এরপর আফ্রিকা, মাদাগাসকার এবং একেরপর এক দেশ পাড়ি দিয়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী এর প্রসার ঘটে। বাদুড় একটি উড়ন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের সামনের পা-গুলি ডানায় রূপান্তরিত এবং পেছনের পা দিয়ে এরা দিনের বেলায় গাছের ডালে উল্টো হয়ে (মাথা ঝুলিয়ে) ঝুলে থাকে। বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি কম যদিওবা ওদের চোখে রড কোশ থাকে। পৃথিবীর প্রায় 800 বাদুড় প্রজাতি ইকোলোকেশন প্রদর্শন করে। রাতের পরিবেশে শিকার ধরার জন্য তাদের এই অভিব্যক্তি।

—সোমা দত্ত, ০৩৩-২৫৮৭১৯৫৯

তথ্যসূত্র : Biology of Animal (vol-II) Ganguly, Adhikari, Sinha

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া,
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা,
ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা,
হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি,
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম।
মো: ৯৪৩৪২১২০৪২।
জলপাইগুড়ি— তপন সেন, সেন ফার্মেসী,
রেল বাজার আলিপুর দুয়ার জং।
কলকাতা : বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩।
চন্দন রায়/চন্দন সুরভি দাস,
কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ২/১৪৫,
বিজয়গড়, যাদবপুর, কল-৩২।
মো: ৯৮৩১৬৯৩০৩৮

ভারতের শক্তি চিত্র

৫ পাতার পর

একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সমান তালে সর্বত্র এই ঘৃণ্য কাজটি ঘটে চলেছে। অর্থাৎ উত্তর প্রদেশে যখন ঘন বন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় উত্তর-পূর্বের আসামে ২৭৮৮ বর্গ কি.মি. এবং দক্ষিণের অন্ধ্রে ১৭৮৮ বর্গ কি.মি. বন লুপ্ত হয়ে গেল।

সম্প্রতি, Indian Statistical Institute, New Delhi -এর এক গবেষক দল উত্তরাঞ্চলের দুটি অংশে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, FSI -এর সমীক্ষায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি বনাঞ্চল কোপের মুখে পড়েছে। FSI-এর তথ্য থেকে আলমোড়া আর বাঘেশ্বর জেলায় ১৯ শতাংশ ঘন অরণ্যে এক ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রয়েছে; অথচ, নতুন সমীক্ষা জানাচ্ছে পরিসংখ্যানটি আসলে ৭৮ শতাংশ।

অরণ্য আর ভারতের সিডিএম

কিয়োটা প্রোটোকলের অধীনে LULUCF-এর যে CDM 9Clean Development Mechanism) বাছাই-এর এক্তিয়ার আছে তা এই কার্বন sequistration ওপর নতুন ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এটাই এর পেছনে মূল চালিকা শক্তি এবং অনেকাংশে এর নিয়ন্ত্রকও বটে। বনসৃজন প্রকল্পগুলি থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির ধারণাটি দাবি করে যে বাড়তি, কার্বন সঞ্চয় এবং নতুন অজ্ঞজনের বাজারে তাকে বিক্রির বন্দোবস্ত ভারতে অমূল্য ডলার-ইউরো আমদানির এক সুবর্ণ সুযোগ নাগালের মধ্যে পাবে। এই ধারণাটির বাজারদর বেশ ভালো কেননা এতে নাকি রাজস্ব বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে। নতুন কার্বন সিঙ্ক তৈরি করো এবং ব্যবসাযোগ্য CER উৎপাদন করো — এই শব্দগুলির মানে প্রায় অধরা থেকে গেলেও এগুলি যে ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে তার সুযোগ ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে উদগ্রীব।

বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা

বিশ্ব ব্যাংকের Forest Strategy, 2003-এর নিদান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল CII-এর বনসৃজনে বেসরকারি স্বার্থান্বেষী অংশগ্রহণ অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রতিস্থাপিত হল ব্যাংকের দ্বারা। ব্যাংক ইতিমধ্যে নিয়ে এল গোষ্ঠীর অধিক অংশগ্রহণের, বনের উপর নিয়ন্ত্রণের, এক নিশ্চিত রূপরেখা ঢেলে সাজা হল Joint Forest Management (বনের উপর নির্ভরশীল মানুষজনের জন্য সুযোগের দরজা খুলে দিয়ে ২০০৬) ধারণা, যাতে বেসরকারি লগ্নিকারীরাও ওতে অংশ নিতে পারে। বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা গেল JFM মডেলটি যথেষ্ট সফল। যদিও বেশিরভাগ গোষ্ঠীই বনাঞ্চলের সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। সমীক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে ব্যাপক ও সুচিন্তিত ধাপে ধাপে সংস্কারের উপর — গোষ্ঠীগুলি যাতে বনাঞ্চলের অজানা-অচেনা অথচ সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগগুলির সুবিধা পেতে পারে। রাজ্যস্তর ও কেন্দ্রীয় স্তরে উভয়ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা অসীম।

যৌথ বন ব্যবস্থাপনা (এম.এস.পি) : এক নতুন অবতার

নতুন Bank CII MoEF-এর নিদান মেনে 'মানের অবনতি ঘটা' অরণ্য ভূমিতে বেসরকারিভাবে ইজারা দেওয়ার কাজটাকে এখন নতুন নামে বলা হচ্ছে 'multi-stakeholder partnership (MSP)। ব্যাপক হারে বাণিজ্যিকভাবে বনসৃজন বৃদ্ধির জন্য এই MSP-র অধীনে সরকার 'মানের অবনতি ঘটা' অরণ্যভূমিকে ৩০ বছরের একটা ইজরায় দিচ্ছে ব্যক্তিগত লগ্নিকারীদের হাতে। এই ধরনের অরণ্যসৃজন থেকে উৎপন্ন হওয়া রাজস্ব ভাগ করে দেওয়া হবে লগ্নিকারী, বনদপ্তর ও জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির অধীনে সংগঠিত আঞ্চলিক কমিটির মধ্যে। এমনভাবে এটি করা হচ্ছে যে, যেন বৃহত্তর সমাজের স্বার্থেই করা হচ্ছে!

ভারত সরকার এখন MSP কার্যকর করার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পথে। শ্রী নামো নারায়ণ মীনা (বন ও পরিবেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী) রাজ্যসভার সদস্য শ্রী পি. কে. মাহেশ্বরীর এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, প্রায় ৩০.৭ মিলিয়ন হেক্টার বাড়তি এলাকাকে যুক্ত করা হয়েছে দেশের ভৌগোলিক এলাকার ৩৩ শতাংশ অংশ সবুজ বন দিয়ে ঢাকার জন্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রক থেকে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে অর্থ সম্পদ সংগঠিত করার জন্য একটি MSP-এর হাতে গড়ে উঠবে কেন্দ্রীভূত অরণ্য ব্যবস্থাপনা। সরকারের দিক থেকে এটা অরণ্যের মালিকানা সংক্রান্ত বিতর্কের একটা সমাপ্তির পদক্ষেপও বটে যার শুরু হয়েছিল ১৯ শতকে ঔপনিবেশিকদের অরণ্য অধিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চাষ কিন্তু ভারতে নতুন নয়। সেই ঔপনিবেশিক কাল থেকে, সরকারচালিত বন দপ্তর পরিকল্পিতভাবে ভারতের বনাঞ্চলের একটা বিরাট অংশ রূপান্তর ঘটিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু অর্থকরী বৃক্ষের আবাদভূমিতে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের বৃক্ষ-রোপণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে তাই এই প্রক্রিয়ার ইতিহাসটা একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

কার্বন বাণিজ্য

৩ পাতার পর

মানুষের জীবন এবং প্রকৃতিকে ণ্য করার বিরুদ্ধে আজ রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন। তা সে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, হরিপুর বা কলিঙ্গনগর অথবা পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা দেশের এরকম অজানা অখ্যাত যেকোনো অঞ্চলই হোক না কেন। সম্ভবত সাধারণ মানুষের এই তীব্র প্রতিরোধই পারবে পৃথিবীর জলবায়ুকে নিষ্কলঙ্ক করে তুলতে।

আজকের আলোচনাসভায় এই জলবায়ু সংকট ও সর্বগ্রাসী উন্নতির মধ্যে যে যোগসূত্র, সে বিষয়ে আমরা কথা বলব। আমরা বুঝতে চেষ্টা করব জলবায়ু নিয়ে রাজনীতির জটিল খেলা এবং উন্নয়ন ও বাজারি বিকল্পের অর্থনীতি এর সঙ্গে কীভাবে জুড়ে আছে সেটা দেখার। আমরা এটাও জানব যে, কীভাবে সারা বিশ্বের মানুষজন এই রাজনীতির বিরুদ্ধতা করছে। আর এসবের মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে নেব।

বিচিত্র কয়েকটি শূক কীটের কাহিনী

বিভিন্ন মথেরা রাত্রিবেলা সাদা দেওয়াল ছেয়ে একরাশ ফুলের মতো বসেছিলো। পশ্চিমবঙ্গের তরাইয়ের বা ডুয়ার্সের জঙ্গলের ধারে, ছোট্ট একটা বাংলোয় এব্যাপারটা দেখা গিয়েছে। তখন বাইরের বারান্দায়, একটি বিজলি বাতি, সারারাত ধরে জ্বলছিল। রাত বেশি বাকী নেই। ওখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, সবাই রাতের প্রজাপতি বা মথেদের রঙরূপের বিচিত্র ডালি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মথেরা যে সবাই রাতচরা তা নয়। প্রজাপতিরাও যে সবাই দিনচরা তাও নয়। ওদের মধ্যে তফাত দেখা যায় — শুঙ্গ আর ডানার গড়ন ধরনের। ওই জঙ্গলে বিভিন্ন বাংলোয় যেসব রাতের প্রজাপতি আসে তা পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, ওরা কত বিচিত্র রঙে রঙিন। লাল, হলুদ, কমলা, সবুজ — বিচিত্র সব নকশা, ছাপছোপ। সকালের রাঙা রোদ মেখে রাস্তায় হাঁটলে, ডুয়ার্সের প্রকৃতির অসীম বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। মন এদিক-ওদিক যেতে চাইলেও, চোখ সতর্ক থাকলে, ভ্রমণকারী দেখতে পাবেন, পলাশ পাতার নীচে, হলুদ রঙের শুঁয়োপোকা। শুঁয়োপোকাটার, শুঁয়োর উপর হলদে কাঁটা, কালো রঙের আড়াআড়ি ছোপ। এই অঞ্চলে পলাশ গাছ কম দেখা যায়। শূককীটগুলি পলাশপাতা খেয়েছিল। তাই ওই গাছে আধখাওয়া পলাশ পাতা পর্যবেক্ষণকারীর নজরে পড়বে।

ওই বনে শালবনের মাঝে, একঝাঁক সেগুন গাছ আছে। গাছগুলোর বয়স বেশি নয়। সরু খুঁটির মতো গুঁড়ির চারপাশে নরম, লোমশ, মোটা মোটা পাতা। কয়েকটা পাতা জালের মতো ফুটো ফুটো হয়ে আছে। বয়স্ক সেগুন পাতা, নিজে থেকেই এরকমটা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কচি পাতায় এমন কাণ্ড অন্য ইশারা দিচ্ছে। কাছে গিয়ে খুঁজতে, পাতার নীচে থেকে কালো-সাদা-লাল-হলুদ নক্শাদার শুঁয়োওয়ালার শূকটার দেখা পাবেন পর্যবেক্ষণকারী।

এইসব শূককীটগুলো বিচিত্র-সুন্দর দেখতে হলেও, প্রজাপতি হয়ে ফোটার পরে, এদের চেহারা হয় সাদামাটা, মেটে রঙের। সামনের ডানা দুটোতে চক্রাকার নকশা দেখা গেলেও, পিছনের ডানাজোড়াতে সাধারণত একরঙা নকশা দেখা যায়। বসার সময়ে, সামনের ডানাজোড়া পেছনের ডানা দুটোর উপর চাপানো থাকে। সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা ত্রিভুজের মতো দেখায়। বিজ্ঞান লেখক শ্রী অয়ন ঘোষ রাতের প্রজাপতির এই দলটার নাম দিয়েছেন 'বানজারা'।

বিজ্ঞান গবেষক শ্রী অয়ন ঘোষ, শাল-সেগুনের গাছের গোড়ায় ফাঁকা জমিতে, বেঁটে আকারের কুলগাছের ঝোপ দেখলেন। উৎসুক হয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, কুলপাতায় জোঁকের ভঙ্গিতে চলাফেরা করা শুঁয়োপোকা। এই শুঁয়োপোকাটা সরু, লম্বা গড়ন। গায়ে কোনো শুঁয়ো নেই। চলা-ফেরার ভঙ্গি জোঁকের মতো। এরকম শূককীট আগেও দেখা গেছে। গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ লোক এদের 'ঘোড়া পোকা' বলে। এই শূককীটগুলো থেকে যে মথ বেরোয়, তাদের চারজোড়া ডানার নকশা একই ধরনের। ডানা ছড়িয়ে বসলে, চারজোড়া ডানাকে, দু'জোড়া বলে মনে হয়। এদের 'তুরঙ্গ দলের প্রজাপতি বলা যায়।

এরপর শ্রী অয়ন ঘোষ শাল-সেগুনের বন পেরিয়ে, কুলগাছের ঝোপ ছাড়িয়ে, একটা ঘাস জমির ভিতর পৌঁছে গেলেন। দেখলেন, লম্বা লম্বা ঘাসের ফাঁকফোকরে নানা ধরনের ঔষধি গাছের ঝোপ। তেমনই একটা ঝোপের অনেকগুলো পাতা মাঝ-বরাবর লম্বা করে ভাঁজ করা দেখে সন্দেহ হলো। একটা পাতার ভাঁজ খুলতে গিয়ে দেখা গেলো পাতার কিনারা বরাবর মাকড়সার জালের মতো আঠালো সুতো দিয়ে আটকানো। সুতো ছাড়িয়ে পাতার, ভাঁজ খুলে একটা লালমাথা সবুজ রঙের শূকের সন্ধান পাওয়া গেল। পাতাটা ছেড়ে দিতে পোকাটা খুব তৎপরতার সঙ্গে পাতার কিনারা বরাবর, মুখ থেকে বার করা রস লাগাতে শুরু করলো। খুব তাড়াতাড়ি, রসটা শুকিয়ে সিল্কের সুতোর মতো টানা-পোড়েন বুনোট হয়ে গেল। সুতোর টানে পাতাটা বুজে এলো। এই পাতার মোড়কটা ওর আশ্রয়, আবার খাবারও বটে।

এরপর তিনি দেখলেন, মাকড়সার জালে, কয়েকটা শুকনো কাঠি আর পাতা আটকে ঝুলছে। প্রথম দেখায়, তার এমনটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু কাঠির আড়াল থেকে একটা ছোটো মাথা আর তিনজোড়া পা বেরিয়ে এসে, একটা পাতার কিনারা বেছে ধরতে দেখে, তিনি আশ্চর্য হলেন! তারপর, পাতা কেটে খাবার ভঙ্গি দেখে, তিনি চিনতে পারলেন, এটা কোনো প্রজাপতি বা মথের শূককীট।

—সানি গুহ

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ০৩৩-২৮৭৬০৭২০, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯৯২ ।
সম্পাদক মণ্ডলী— সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in